উপসংহার

উনিশ শতক বাঙালীর নিকট এক গৌরবময় অধ্যায়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা বাঙালীকে আত্মজাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত করে। এর ফলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে শুরু হয় বাঙালীর আত্মজাগরণের পালা। উনিশ শতকের যুগ চিন্তানায়কগণ উদার, নিরপেক্ষ ও যুক্তিনির্ভর জীবনদর্শনকে সমগ্র বাঙালীর কাছে তুলে ধরার জন্য উদগ্রীব হন। এই সময় রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ যুগ চিন্তানায়কগণ 'আত্মীয়সভা', 'ব্রাহ্মসভা', 'তত্ত্ববোধিনী সভা', 'হিন্দু মেলা', 'ভারত সভা' বিভিন্ন সভা সংগঠন ও 'ব্রাহ্মণসেবধি', 'সংবাদ প্রভাকর', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল চিন্তাচেতনাকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেন। জাতীয় জীবনের এরকম পরিবর্তনে বাংলা সাহিত্য নীরব হয়ে থাকে নি। বাংলা সাহিত্য শিল্প হিসাবে রূপে-রসে সমৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতিকে সঠিক পথনির্দেশ করার দায়িত্ব পালন করেছে। 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা' বিষয়ক গবেষণাকর্মে বাংলা সাহিত্যের সেই মহৎ দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আলোচনা করা হয়েছে। সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে জাতিকে অনুপ্রেরণা বা উৎসাহ দিয়ে জাতীয় জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার মন্ত্র শুনিয়েছেন।

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য তার সংকীর্ণ পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে পড়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। পরিবর্তন আসে বিষয়ে-রূপে-রীতিতে। এই সময়ের বাংলা সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের যোগ্যতা লাভ করার পথে অগ্রসর হয়েছে। ফলে আধুনিক গীতিকবিতা, সাহিত্যিক মহাকাব্য, নাটক, প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্য একাধিক নতুন প্রকরণে বিশুদ্ধ সাহিত্য রসের আবেদনে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়।

'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা' নামক আমার গবেষণাকর্মটিকে মোট আটটি অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে বাঙালীর আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে উনিশ শতকের সাহিত্যের ভূমিকার আলোচনা করা হয়। অবশ্য প্রথম অধ্যায় 'প্রাক্ উনিশ শতকীয় সমাজ ভাবনা ও স্বদেশ ভাবনা'য় বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করা হয়নি। তবে এখানে উনিশ শতকের উদার ও নিরপেক্ষ ভাবধারার প্রাক্ ইতিহাস আছে। 'প্রাক্ উনিশ শতকীয় সমাজ ভাবনা ও স্বদেশ ভাবনা'য় বাঙালীর চরম অধঃপতনের স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে। আমরা লক্ষ করেছি, এই সময় বাঙালী কতগুলি অর্থহীন আচার-আচরণ, রীতি-নীতিকে ধর্ম বা পূণ্য অর্জনের পথ বলে মেনে নিয়েছে। এছাড়া উনিশ শতকে যাঁরা উদার, যুক্তিবাদী ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে জাতিকে সমৃদ্ধ করতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন — তাঁদের আবির্ভাবের সূত্র প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগের সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা' অংশে ধর্ম সংস্কার, সমাজ সংস্কার, শিক্ষাসংস্কার প্রভৃতি সংস্কারমূলক আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই সময়ের প্রতিটি রচনায় প্রাক্ উনিশ শতকের সংকীর্ণ ধর্মীয়চেতনা বা সংকীর্ণ সমাজচেতনাকে সংস্কার করার প্রবণতা যুগ চিন্তানায়কগণের মধ্যে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। রামমোহন ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি সংস্কার করার জন্য বাংলা গদ্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি স্বদেশের সবরকম দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য নতুন দর্শনের সৃষ্টি করে বলেন মানুষের জীবন শাস্ত্র ও বুদ্ধি উভয়েরই দ্বারা চালিত হওয়া উচিত। তাঁর 'বেদান্তগ্রন্থ' বা 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের সম্বাদ' জাতীয় রচনা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। বিদ্যাসাগর শিক্ষা প্রচার ও সমাজ সংস্কারকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলা গদ্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। এ বিষয়ে তাঁর রচনা 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' বা 'বর্ণপরিচয়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অক্ষয়কুমার দত্ত বাঙালীকে সংকীর্ণতা মুক্ত ও সমৃদ্ধ করার জন্য এবং শিক্ষার উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য লেখনী ধারণ করতেন। তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' বা 'চারুপাঠ' প্রভৃতি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্মীয় শৃঙ্খলা আনার জন্য ধর্ম সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। এ বিষয়ে তাঁর একাধিক গ্রন্থ 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান', বা 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কয়েকজন সংস্কারপন্থী ব্যক্তির রঙ্গব্যঙ্গমূলক সাহিত্যের দ্বারা বাঙালীর জীবনকে সুপথে চালনা করার মনোভাব। এখানে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র ও হুতোম প্যাঁচা ওরফে কালীপ্রসন্ন সিংহের নক্সা ও নক্সা জাতীয় রচনার আলোচনা করা হয়েছে। ভবানীচরণের 'নব বাবু বিলাস', 'নব বিবি বিলাস' ও 'কলিকাতা কমলালয়'-এ মূলত সমকালের কলকাতার নাগরিক শ্রেণীর বিকৃত জীবনাচরণকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে সন্তানকে শিক্ষিত করার সমকালীন ছবি তুলে ধরেন। মদ্য পানের কুফল দেখিয়ে 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' রচনা করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'-য় সমকালীন কলকাতার বিকৃত জীবনাচরণকে তীক্ষ্ণ ও তীব্র ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় — 'উনিশ শতকের নাট্য সাহিত্যে (নাটক ও প্রহসন) স্বদেশ ভাবনা' আলোচনায় আমরা চারটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছি, যথা — বাংলা নাটকের উদ্ভব পর্ব, সমাজ সংস্কারে বাংলা নাটক ও প্রহসনের ভূমিকা, জাতীয়তাবাদ প্রচারে বাংলা নাটকের ভূমিকা ও বাঙালীর একান্ত নিজস্ব নাটক রচনার উদ্যোগ। এ বিষয়ে জি.সি. গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখের আন্তরিক সদিচ্ছায় বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ হয়। সমকালের সমাজ সংস্কার ও সমাজের বিকৃত রূপের

সমাধানে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব'; উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ'; মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'; দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'; গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসনের আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদের প্রচারে বাংলা নাটকের ভূমিকা প্রাতঃস্মরণীয়। আমরা জানি — বাংলা নাটকের শক্তির কথা মাথায় রেখে বৃটিশ সরকার এদেশে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন করে। উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' বা 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী' প্রভৃতি নাটক জাতীয়তাবাদের প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বাংলা নাটককে বাঙালীর রুচির নাটকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেন। এই বিশেষ প্রবণতাকে বাঙালীর নিজস্ব নাটকের সন্ধানে অংশে আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে — 'উনিশ শতকের মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যে স্বদেশ ভাবনা' অংশে বলা হয়েছে, উনিশ শতকে সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্য রচনার উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বাংলা কাব্যসাহিত্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য রচিত। বলা যায় তাঁর বাংলা কাব্যচর্চার পেছনে উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। যথা - বাংলা কাব্যকে উৎকর্ষতা দান, পরাধীন জাতির মনে দেশানুরাগ জাগানো, পাঠকের মনে মানবিক অনুভুতিকে সতেজ করা ও বিশুদ্ধ কাব্যরস সৃষ্টি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষতা সৃষ্টির জন্য মধুসূদন দত্ত বাংলায় কাব্যসাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর যেন আবির্ভাব হয়েছিল বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্যই। এছাড়া এজাতীয় কাব্যের দ্বারা কবিগণ পাঠককে নীতিশিক্ষা ও জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত করার কাজটি সম্পাদন করেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার কাব্য' ও নবীনচন্দ্র সেনের 'ত্রয়ীকাব্য' এই বিশেষ উদ্দেশে রচিত। অর্থাৎ এই অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীকে সচেতন করারও উদ্যোগ ছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আধুনিক গীতিকবির কাব্যের মধ্যে স্বদেশ ভাবনার অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই অধ্যায়টিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গীতিকবিতার উদ্ভব পর্বে স্বদেশ ভাবনার আলোচনায় মূলত কবি ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় স্বদেশ ভাবনাকে আলোচনা করা হয়। জাতীয়তাবাদের যুগে গীতিকবিতা রচনায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন বাঙালীকে নানাভাবে সচেতন করার চেষ্টা করেন। গীতিকবিতার আস্বাদ নামক পর্বে মধুসূদন দত্তের গীতিকবিতায় স্বদেশ ভাবনার আলোচনা আছে। মধুসূদন দত্ত যে পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করে সাহেব হয়েও বাংলা তথা ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করতেন তার প্রকাশ ঘটেছে। এবং বিশুদ্ধ গীতিকবিতার আলোচনায় স্থান পেয়েছে বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এঁদের মনোভাবে স্বদেশ ভাবনা

যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। বিহারীলাল বিশুদ্ধ গীতিকাব্যধারার প্রবর্তন করলেও তাঁর কবিতায় দেশানুরাগ রয়েছে, আর রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের সমস্ত রকমের দুর্বলতা, ভীরুতা, দরিদ্রতা সর্বপরি জীবনের মানোন্নয়নের জন্য মুক্তিমন্ত্র তাঁর গীতিকবিতায় ধ্বনিত করেছেন, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাতেও দেশানুরাগের সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব উনিশ শতকে গীতিকবিগণ স্বদেশ ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাঙালী পাঠককে প্রভাবিত করতে উদ্যোগী হয়েছেন — এমন দাবী করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে 'উনিশ শতকের কথাসাহিত্যে (উপন্যাস ও ছোটগল্প) স্বদেশ ভাবনা'-র আলোচনায় কথাসাহিত্যের উদ্ভব, কথাসাহিত্যের দ্বারা সমকালের বাঙালী জীবনের মানোন্নয়নে উৎসাহ ও জাতীয়তাবোধের প্রচার বিষয়ে আলোচনা আছে। উনিশ শতকে লক্ষ করি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলা উপন্যাসকে শিল্পরূপ দানের জন্য আন্তরিক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের প্রথম দু'টি উপন্যাস লিখতে গিয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন, ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর তিনি নানারকম নীতি-আদর্শ প্রচার করেন। রমেশচন্দ্র তো মাতৃভাষায় সাহিত্যকে উন্নত করা ও পাঠকের মনে জাতীয়তাবোধ জাগরণের উদ্দেশে কলম ধরেছেন, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সমকালের রোমান্স রসে বিভোর বাঙালী পাঠকের কাছে বাস্তবসম্মত উপন্যাস জোগান দেওয়ার জন্য কলম ধরেন। এছাড়া কথাসাহিত্যের অন্য শাখা ছোটগল্পের সার্থক শিল্পরূপ দান ও ছোটগল্পের দ্বারা লোকশিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের এক বড় ভূমিকা লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কথাসাহিত্যিকের উপন্যাস ও গল্পে বাঙালী জীবনের উত্তরণের প্রেরণা লক্ষ করি যাকে আমরা স্বদেশ ভাবনা বলে দাবী করেছি।

অষ্টম অধ্যায়ে 'উনিশ শতকের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা' অংশে যুক্তির উপর নির্ভর করে বাঙালী জীবনের মানোন্নয়নের প্রেরণা লক্ষ করার মতো। এখানে রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নানা যুক্তির দ্বারা প্রচলিত অবাঞ্ছিত জীবনাচরণকে পরিহার করে আরো উন্নত সমৃদ্ধ জীবনলাভের প্রেরণা দিয়েছেন। এই প্রেরণা বা উৎসাহ উনিশ শতকে রচিত 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'আলোচনা', 'সমালোচনা', 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ' প্রভৃতি রচনায় লক্ষ করি।

প্রতিটি অধ্যায়ে বাঙালীর জাতীয় জীবনকে আরো সমৃদ্ধ ও উন্নত করতে বাংলা সাহিত্যের মহৎ প্রেরণাকে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র উনিশ শতকে কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিকগণ অবক্ষয়িত জাতীয় জীবনকে উত্তরণের পথে এগিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের এই মহৎ কর্তব্য বাঙালী জীবনের মানকে

উন্নত করেছে। উনিশ শতকের গোড়ায় (১৮১৫) বাঙালীর জীবনে উন্নতির লক্ষ্যে রামমোহন রায় বুদ্ধি ও শাস্ত্রকে অনুসরণ করার যে দর্শন বাংলা সাহিত্যের দ্বারা সূচনা করেছিলেন, সমগ্র শতক জুড়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বর গুপ্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বাঙালী জীবনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলা সাহিত্যের দ্বারা নানাভাবে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন। আর তাই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মধুসূদন প্রসঙ্গে বলেছিলেন — "আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা সংশয় করি না — এই ভূমণ্ডলে বাঙ্গালি জাতির গৌরব হইবে।" ঋষি বঙ্কিমের এই প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকে নি। এই শতকের শেষে বাঙালী বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি বিষয়ে বিশ্ববাসীর মন জয় করেছে। তাই রাজনীতি সচেতন পরবর্তী শতকের গোড়ায় বাঙালী বৃটিশ শাসকের বঙ্গভঙ্গের ষড়যন্ত্রকে তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে রদ করে দেয়। শুধু তাই নয় বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র বসু, ধর্মে স্বামী বিবেকানন্দ ও সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিশ্ববরেণ্য বাঙালীর পরিচয় পাই। অতএব পরবর্তী শতকের গোড়ায় বাঙালীর পরিপূর্ণ আত্মচেতনার বিকাশে ও উনিশ শতকেই বিশ্ববরেণ্য বাঙালীর আবির্ভাবে সমগ্র উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে — সেকথা বলাই বাহুল্য।